~~জামাইষষ্ঠী ১৪২৭~~

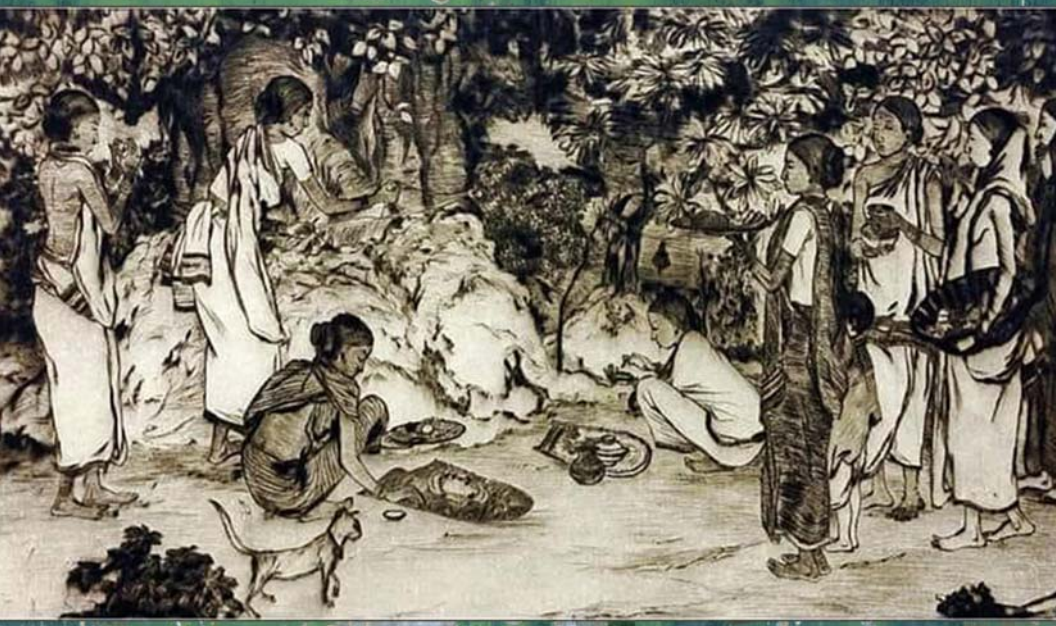

অরণ্যষষ্ঠী

করোনার আক্রমণে অন্তরীণ অবস্থায়
১ বৈশাখ ১৪২৭ থেকে 'হরপ্পা'-র
বৈদ্যুতিন পুস্তিকা প্রকাশের সূচনা।
এই ক্রমে জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে প্রকাশিত
হল আমাদের তৃতীয় প্রয়াস
'অরণ্যষষ্ঠী'।

তথ্যসংশ্লেষ ও লিখন
সৌম্যদীপ ও সৈকত

শিল্পনির্দেশনা
সোমনাথ ঘোষ

প্রচ্ছদ
সৌম্যদীপ

প্রচ্ছদচিত্র: সমর ঘোষ
(সৌজন্যে: মুকুল দে আর্কাইভস)

আলোকচিত্র
সৈকত

http://harappa.co.in/
harappamagazine@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/harappalikhanchitran/

ব্রত-পার্বণ-জড়ানো বাঙালি-জীবনে বছরভর পালন-করা চলা ব্রতগুলি লোকায়ত, তা কোনো শাস্ত্র বা বৈদিক তত্ত্ব বা সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত নয়। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর *বাংলার ব্রতকথা*-য় বলেছেন:

"বেশ বোঝা যায়, হিন্দুধর্মের সুলভ সংস্করণ হিন্দুব্রত-মালাবিধান চিনির ডেলার আকারে যেন কুইনাইন পিল। লোকের মধ্যে হিন্দুধর্মের জটিল অনুষ্ঠান এবং নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে তন্ত্র ও পুরাণকে ব্রতের ছাঁচ দিয়ে রচনা করা হয়েছে। খাঁটি পুরাণগুলির ইতিহাস হিসাবে একটা দাম আছে।

কিন্তু, এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি না পুরাতন আচার-ব্যবহারের চর্চার বেলায় না লোকসাহিত্য বা লৌকিক ধর্মাচরণের অনুসন্ধানের সময় কাজে লাগে। লোকের সঙ্গে এই ব্রতগুলির খুব কম যোগ, লোকের চেষ্টা লোকের চিন্তার ছাপ এই শাস্ত্রীয় ব্রতগুলি মোটেই নয়। ছাঁচটা এদের ব্রতের মতো হলেও জোড়াতাড়া দেওয়া কৃত্রিম পদার্থে যে জড়তা সেটা শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির সমস্তটার মধ্যে লক্ষ করা যায়। যজুঃ এবং সামবেদের অনেক মন্ত্র ও অনুষ্ঠান এই ব্রতগুলিতে থাকলেও বৈদিক ক্রিয়ার সঙ্গে এগুলির কলের পুতুলে আর জীবন্ত মানুষের মতো প্রভেদ, শুধু তাই নয়, যে লৌকিক ব্রতের ছদ্মবেশে এগুলিকে সাজানো হয়েছে সেই খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলির সঙ্গেও এদের ওই একই রকম প্রভেদ। খাঁটি মেয়েলি ব্রতগুলিতে, তার ছড়ায় এবং আলপনায় একটা জাতির মনের, তাদের চিন্তার, তাদের চেষ্টার ছাপ পাই। বেদের সূক্তগুলিতেও সমগ্র আর্যজাতির একটা চিন্তা, তার উদ্যম-উৎসাহ ফুটে উঠেছে দেখি।”

তিনি বিশ্বাস করতেন এই ব্রতগুলির সৃষ্টি কোনোভাবেই বেদ বা পুরাণের ছাঁচ থেকে নয়:

“... পুরাণ ভেঙে যেমন শাস্ত্রীয় ব্রত তেমনি বেদ ভেঙে এই মেয়েলি ব্রতগুলির সৃষ্টি হয়েছে, এ কথা একেবারেই বলা যায় না। কেননা সমস্ত প্রাচীন জাতির ইতিহাসেই দেখা যায় আদিম মানুষের মধ্যে বায়ু সূর্য চন্দ্র এরা উপাসিত হচ্ছেন— ভারতবর্ষে, ইজিপ্তে, মেক্সিকোতে। সুতরাং বাংলার ব্রতের ছড়াগুলি বাঙালির ঘরের জিনিস বলে ধরা যেতে পারে; এটা আরো পরিষ্কার হয়ে উঠবে ব্রতগুলির সম্পূর্ণ চেহারাটি আমরা

যখন দেখব। এক দিকে ভারতে প্রবাসী আর্যদের অনুষ্ঠান, আর-এক দিকে ভারতের নিবাসীদের ব্রত, এক দল তপোবনের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছেন, আর-এক দল নদীমাতৃক পল্লীগ্রামের নিভৃত নীড়ে বসতি করছেন। এই প্রবাসী এবং নিবাসী দুই দলের মধ্যে রয়েছে হিন্দুজাতি, যারা বেদের দেবতাদের দেখছে বিরাট সব মূর্তিতে এবং তারই বিরাট অনুষ্ঠানের ভার চাপাতে চাচ্ছে আদিম যারা তাদের মনের উপরে, কর্মের উপরে-তাদের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তার স্বাধীনতা ও স্মৃতি সবলে নিষ্পেষিত করে দিয়ে। বেদ, পুরাণ ও পুরাণের চেয়েও যা পুরোনো এই-সব লৌকিক ব্রত-অনুষ্ঠান, এদের ইতিহাস এইটেই প্রমাণ করছে—দুই দিকে দুটো বড়ো জাতির প্রাণের কথা, মাঝে একটি দলবিশেষের স্বপ্ন।”

দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত মেয়েলি ব্রতগুলি আমাদের প্রকৃতি-পরিবেশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, ঋতু যেমন বদলায় তেমনই পালটায় নানা ঋতুর ব্রত সংসারের মঙ্গল কামনায় :

“মেয়েলি ব্রত বা খাঁটি ব্রত তা নয়। সেখানে কামনা যত-রকম তার চরিতার্থতার প্রক্রিয়াও তত-রকম। বৈশাখে পুকুরে জল না শুকোয়, গরমে গাছ না মরে, এই কামনা করে পূর্ণিপুকুর; সেখানে ক্রিয়া হচ্ছে পুকুর কাটা, তার মধ্যে বেলের ডাল পোতা, পুকুরে জল ঢেলে পূর্ণ করা, তার পর বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারি ধারে ফুল সাজানো এবং ছড়া বলে বেলের ডালে ফুল ধরা:

পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা।
কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী

ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবে না
পৃথিবীতে ধরবে না। ইত্যাদি।

আবার যখন বৃষ্টির কামনা করে বসুধারা ব্রত তখন আলপনায় আট তারা আঁকতে হচ্ছে, একটি মাটির ঘটে ফুটো করে বৃষ্টির অনুকরণে গাছের মাথায় জল ঢালা হচ্ছে: এমনি নানা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষ কামনা জানাচ্ছে—

গঙ্গা গঙ্গা ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ বাসুকি
তিন কুল ভরে দাও বনে জনে সুখী।"

তিনি আশঙ্কা করেছেন, "হিন্দুধর্মের প্রাদুর্ভাবের সঙ্গে লৌকিক ব্রতের চেহারা এমন অদলবদল হয়ে গিয়েছে যে, এখন যে ব্রতগুলি খাঁটি অবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে তা অতি অল্প, এবং দু-চারটি ছাড়া সেগুলিও খণ্ড অসম্পূর্ণ অবস্থায় আমরা পাই। বাংলার ব্রতগুলি কতক-কতক সংগ্রহ হতে আরম্ভ হয়েছে, সবগুলি সম্পূর্ণ আকারে এখনও সংগ্রহ ও প্রকাশ হবার অনেক দেরি, এবং অন্তঃপুরের জীবনযাত্রার বদলের সঙ্গে সঙ্গে এই-সব ব্রত করবার এবং ব্রতগুলির অনুষ্ঠান ঠিকঠাক মনে রাখবার চেষ্টাও কমে চলে গিয়েছে। এ অবস্থায় যা হচ্ছে তাতে খাঁটি নকল সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ সবই আমরা গ্রহণ করতে চলেছি। ব্রতের আলপনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই খাঁটি নকশার মধ্যে মেকিও চলেছে। তেমনি ছড়াগুলির মধ্যেও হয়তো যেখানকার যা সেগুলো উলটে কোথাও একছত্র নতুন, কোথাও এক ব্রতের ছড়া অন্য ব্রতে—এমনি সব কাণ্ড। এ ছাড়া নানা গ্রামের নানা অনুষ্ঠান, একই ব্রত এখানে এক-রকম ওখানে অন্য। এমনি সব নানা জঞ্জালের মধ্যে

থেকে খাঁটি ব্রতের চেহারাটির একটা আদর্শ বার করে আনতে হলে শুধু এদেশের ব্রতগুলিকে নিয়ে নাড়াচাড়া করে ফল হবে না, পৃথিবীতে সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে ব্রত-অনুষ্ঠান কীভাবে চলেছে তার ইতিহাসগুলিও দেখা চাই।"

প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ের সঙ্গে যুঝতে থাকা মানুষের এই ব্রত উদ্‌যাপন তাই তাঁর মতে বহু প্রাচীন: "ব্রত হচ্ছে মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষের কিংবা বিশেষ দলের মধ্যে সেটা বদ্ধ নয়, এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এটাও বেশ বলা যায় যে, ঋতুপরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের যে দশাবিপর্যয় ঘটত সেইগুলোকে ঠেকাবার ইচ্ছা এবং চেষ্টা থেকেই ব্রতক্রিয়ার উৎপত্তি। বিচিত্র অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মানুষে বিচিত্র কামনা সফল করতে চাচ্ছে, এই হল ব্রত, পুরাণের চেয়ে নিশ্চয়ই পুরোনো বেদের সমসাময়িক কিংবা তারও পূর্বেকার মানুষদের অনুষ্ঠান।"

বাংলার এই প্রাচীন ব্রতগুলির মধ্যে অন্যতম পুরোনো ব্রত হল মা ষষ্ঠীর ব্রত। এগুলি মূলত বছরজুড়ে পালন করা হয়। দীনেন্দ্রকুমার সরকার 'বারো মাসে তের পার্বণ ও ষষ্ঠীব্রত' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ('লোক ও লৌকিক' পত্রিকা) বলেছেন যে তেরো পার্বণ আসলে তেরোটি ষষ্ঠীব্রত। সৌরবৎসরকে চন্দ্রকলার হ্রাস-বৃদ্ধি অনুসারে ভাগ করলে তেরোটি মাস মেলে, তা থেকেই তেরো পার্বণ। প্রতিমাসে নির্দিষ্ট তিথিতে কেবলমাত্র তেরোটি ষষ্ঠীব্রতই পালনের নির্দেশ দেওয়া আছে শাস্ত্রীয় পঞ্জিকায়। সেই তিথিগুলিতে ষষ্ঠী পুজো করা হয়ে থাকে। তবে প্রচলিত মতে বৈশাখ, আষাঢ়, কার্তিক ও ফাল্গুন মাসে ষষ্ঠীর পুজো করা হয় না।

ঠিক যেমন ষষ্ঠীর ব্রত সোম ও শনিবারে পড়লে পালন করা হয় না। বারো মাসে তেরো পার্বণের ছোঁয়া পাওয়া যায় শীলা বসাক সংগৃহীত অরণ্যষষ্ঠীর ছড়াতেও:

জ্যৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষাট।
ফিরে ঘুরে এল ষাট।।
বারো মাসে তেরো ষাট।
ষাট ষাট ষাট।।
ঝি-চাকরের ষাট।
গোরু বাছুরের ষাট।।
কর্তার ষাট, ছেলেমেয়ের ষাট।
বউ ঝিয়ের ষাট, নাতি-নাতনির ষাট।
ষাট ষাট ষাট।।

অন্য ব্রতের দেবদেবীদের মতো ষষ্ঠীও পূজিতা ভয়ে ও ভক্তিতে। পরিজনের একান্ত মঙ্গল কামনায়। আশুতোষ ভট্টাচার্য সে-কারণে সঠিকভাবেই বলেছেন, "[...] দেবতাকে যেমন অনিষ্টকারী বলিয়া মনে করা হয়, আবার তেমনই সেই অনিষ্টকারী দেবতাকেই কোন উপায়ে তুষ্ট করিতে পারিলে, তাহা দ্বারা কল্যাণ সাধিত হইবার কথাও কল্পিত হইয়া থাকে; [...] দেবদেবী সম্পর্কিত এই বিশ্বাসই ব্রতকথার ভিতর দিয়া প্রচার করা হয়।"

ষষ্ঠীর নানা রূপ কল্পনা করা হয়, এমনকি তাঁর তুলনা টানা হয় বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী হারিতির সঙ্গে। দেবী হারিতি হলেন বজ্রযান সম্প্রদায়ের আরাধ্যা দেবী, তাঁর সঙ্গে ষষ্ঠী দেবীর অনেক সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়।। পুরাণ মতে হারিতিও ছিলেন একজন যক্ষিণী বা রাক্ষসী, যিনি রাজগৃহে থাকতেন যখন গৌতম বুদ্ধ সেখানে

বাস করতেন। প্রথমে তিনি ছিলেন শিশুদের অনিষ্টকারী কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের বোধিজ্ঞান লাভ পর তিনি শিশুদের রক্ষয়িত্রী দেবীতে রূপান্তরিত হন। বিবর্তনের আদিযুগে হারিতির শিশু অনিষ্টকারী গুণটি ষষ্ঠীতে আরোপিত হয়।

আমাদের বাংলার ব্রতের আরাধ্যা ষষ্ঠী প্রজনন ও শিশুরক্ষার দেবী। কোনো-কোনো জায়গায় যেমন রাজশাহি জেলার ক্ষীরহর গ্রামে (এখানে একটি চতুর্ভুজা ষষ্ঠীমূর্তি ও তাঁর ক্রোড়ে শিশুসন্তান এবং দেবীর দক্ষিণপদ ঊর্ধ্বমুখী একটি বিড়ালের উপর স্থাপিত আছে। এই মূর্তির দক্ষিণ হস্তে আছে সপত্র বৃক্ষশাখা। আবার বগুড়া জেলায় অনুরূপ একটি ষষ্ঠীমূর্তির দক্ষিণহস্তে বজ্র আছে বলে জানা যায়।) দেবীর মূর্তি থাকলেও সর্বত্র ষষ্ঠীর মূর্তি পুজো করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে শিলাখণ্ডকেও ষষ্ঠীরূপে পুজো করা হয়। যেমন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার শিরাকোল ও আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে ষষ্ঠীকে ব্যাপকভাবে শিলাখণ্ডরূপে পুজোর প্রচলন। মন্দিরে শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তির সঙ্গে ষষ্ঠীদেবীর শিলাখণ্ড ভক্তগণ তেল সিঁদুর মাখিয়ে পুজো করেন।

সাধারণত শিশুর জন্মের পর ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে ষষ্ঠীর অর্চনার বিধি আছে। ষষ্ঠদিনে যে-ষষ্ঠীপুজো হয় সেটি 'সূতিকাষষ্ঠী' বা 'ঘাটষষ্ঠী' নামে পরিচিত। কোনো-কোনো অঞ্চলে একেই আবার 'ষেঠেরা' বা 'যাটষষ্ঠী' বলে। মূলত আঁতুড়ঘরে পুজোটি হয় বলে একে সূতিকাষষ্ঠীও বলে। এই সূতিকাষষ্ঠীকে বাদ দিয়ে হিন্দুধর্মে কোনো গোষ্ঠী বা গোত্রের কল্পনা করা যায় না। ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের বাড়িতেই জন্মের ছয়দিনের দিন সূতিকাষষ্ঠী পুজো হয়। শিশুর ঘরে রাতে একটা ছোটো পিঁড়ি ও

একটা জলভরা ঘট পাতা হয়। সঙ্গে থাকে একটা গামছা। পাশে কলার খোলা বা পাতা কিংবা রেকাবে থাকে সোয়া সের চাল, ধান। একটা কুলোর মধ্যে পান-সুপারি, লাল সুতো, দোয়াত, কালি, খাগের কলম, কিছু কদমা, বাতাসা, মিষ্টি, পুজোর সামগ্রী, তিনটি হলুদ, সামর্থ্যানুযায়ী দক্ষিণা ইত্যাদি। ষষ্ঠীর আসনে দেওয়া হয় একটি অখণ্ড কলার ছড়া। কোথাও-কোথাও ইঁদুরের মাটি ও সাপের খোলসও দেয়। এইদিন সারারাত ঘরে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়। বিশ্বাস যে ওই রাতে বিধাতাপুরুষ নিজে এসে জাতকের ভাগ্যলিপি লেখেন। তাঁর উদ্দেশে দেওয়া হয় লেখনী আর তালপাতা। এই সূতিকাষষ্ঠীর পূজারী হন দাইমা নিজেই। এই রাতকে অনেকে বলেন 'ছয়রাত'।

ডি ডি কোসাম্বির মতে, "The sati and the Sati Asara should not be confused with each other nor with a remarkable, Primitive and dangerous mother goddess satvai or satvi or the last also a term of abuse in marathi for an unpleasant harridan. The word is derived without question from sanskrit sasthe, the sixth whatever her original name or names were. The goddess satavi is to be propitiated or the sixth night after the birth of any child, with a lamp burning through the night, and certain other articles (Every one of which becomes the perquisite of the midwife at dawn) laid out for her. Among them may be the sadle quern with its muller stone, but writing materials are always included. The goddess comes in

person that night to write the fate and character of the child on its forehead in invisible but immutable words. This is brahminised as the brahmmalikhita."

ষষ্ঠীব্রতের সঙ্গে প্রকৃতি ও পরিবেশের এক নিবিড় যোগাযোগ আমরা খুঁজে পাই। কারণ ষষ্ঠীপুজোকে উপলক্ষ্য করে বৃক্ষকেন্দ্রিক বহুরকম উপাদান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন, ষষ্ঠীব্রত অনেক সময়েই কাঁঠাল বা বটগাছের ডাল পুঁতে করা হয়ে থাকে। এছাড়া ষষ্ঠীপুজোর অন্যতম উপাচারগুলি হল দূর্বা, বাঁশের কিশলয় বা কোড়া, করঞ্চা, আমের পল্লব, মুলো, ঝিঙে ইত্যাদি অরণ্যজীবনের অনুষঙ্গ। শুধু তাই নয়, গ্রামের ষষ্ঠীথানগুলিও মূলত নিম, বট, অশ্বত্থ কিংবা মনসা বা সিজগাছের নীচেই হয়। দেবী ষষ্ঠীর রূপ কল্পনা করে লোকসমাজের মাতৃকুল সেই বৃক্ষেরই পুজো করে চলেছে মনের ভক্তিতে, সন্তানের মঙ্গলকামনায়।

এভাবেই গাছের তলায় মাসে-মাসে ষষ্ঠীর ব্রতপালন সমগ্র বঙ্গদেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং প্রতিটি ষষ্ঠীব্রতেরই পৃথক-পৃথক ব্রতকথার অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। স্থানভেদে একই ব্রতর কথার ভিন্নতাও দেখা যায়। তবে বিভিন্ন ষষ্ঠীব্রতকথাগুলি পাঠ করলে একটি প্রশ্ন বারবার উঠে আসে যে ষষ্ঠীব্রতের 'কথা'র সর্বত্রই ষষ্ঠী হচ্ছেন বুড়ি, 'ষষ্ঠীবুড়ি', তিনি বুড়ি বামনির ছদ্মবেশে হাজির হন। এখন প্রশ্ন হল ষষ্ঠীর কেন এমন বৃদ্ধার বেশ? এর সূত্রসন্ধান করে বলা যায়, ষষ্ঠীকে প্রাচীনতম দেবী বলে মনে করা হয় বলেই তাঁকে বৃদ্ধা রূপে কল্পনা করা হয়। কারণ প্রজনন চিন্তার সঙ্গে পশুপালনমূলক জীবনযাত্রার দিকে লক্ষ রেখেই

এটা সম্ভব হয়েছিল। এর অন্যতম কারণ, লৌকিক ব্রতকথা বা পৌরাণিক কাহিনিতে দেবীরা প্রায় সকলেই উদ্ভিন্নযৌবনা এবং অলোকসামান্য রূপবতী, ব্যতিক্রমী ষষ্ঠীদেবী। তিনি যখনই লৌকিক ব্রতকথায় ভক্তের কাছে আসেন তখন তাঁর রূপ অতি বৃদ্ধার। এই বার্ধক্যই আমাদের তাঁর পুজোর প্রাচীনত্ব নির্ণয় করতে সাহায্য করে। বাংলার ব্রতকথায় ইনি বৃদ্ধারূপে কল্পিত হলেও পুরোহিত শাসিত পুজোপদ্ধতিতে ইনিই আবার গৌরবর্ণা যুবতী হয়েছেন আর্যায়ণ ও প্রজননের দিক থেকে। আর এই আদি সংস্কৃতির পূজারীতিতে ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির সংকরায়ণের ফলে ব্রতাচারের মূল রীতিপদ্ধতির বদল ঘটেছে, প্রবেশ ঘটেছে সংস্কৃতাশ্রয়ী মন্ত্রপাঠ ও নামকরণের। তবে এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে সমস্ত ষষ্ঠীব্রতে এঁর বৃদ্ধার রূপ নেওয়ার কারণ ইনি অপরাপর সমস্ত ব্রতের লৌকিক দেবীগণ অপেক্ষা প্রাচীনতমা।

ষষ্ঠীর বাহন বিড়াল হওয়ার কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে যে, গৃহপালিত অন্য কোনো পশুই এত বেশি বার ও বেশি সংখ্যক সন্তানপ্রসব করতে পারে না। ফলে সে প্রজনন ও শিশুরক্ষার দেবীর বাহন হল। অন্যদিকে বিড়ালের মাতৃস্নেহের সঙ্গে অন্য কোনো প্রাণীর তুলনা হয় না। চোখ না-ফোটা পর্যন্ত শাবকের প্রতি তার আচরণ লক্ষণীয়। তাই সন্তানের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গলকামনাও নারীকুল ষষ্ঠীরূপিণী বিড়ালদেবীর কাছেই করে থাকে— সে যে দেবীর বাহন। এ কারণে গৃহস্থ বাড়িতে, বিশেষ করে যাঁরা ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করেন, তাদের ঘরে বিড়ালকে মান্য করে থাকে। এমনকি বিড়াল মারলে মুখে কুটো নিয়ে দশ বাড়ি মাগন চেয়ে প্রায়শ্চিত্তও করে।

ষষ্ঠীর নাম সংখ্যাবাচক হওয়ার কারণ বৈদিক ও পৌরাণিক তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে সেখানে ছয় সংখ্যার আধিপত্য সর্বত্র। এমনকি অগ্নির ছয়বার বীর্য নিষেকে দেবসেনা লাভ (জন্ম) হয়েছে, এবং ওই নিষেক ঘটেছে শুক্ল বা শুভ্র পক্ষে।

'বাংলার ষষ্ঠীব্রত: শিশুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির নিরিখে একটি পর্যবেক্ষণ' প্রবন্ধে সুবর্ণা সরকার বলেছেন যে, 'স্ত্রী-দেহ বিজ্ঞান' (Gynaecology) বলছে যে রজঃক্ষরণ প্রতিক্ষেত্রেই ছয়দিন পর্যন্ত স্থায়ী। পাঁচদিনের পর অর্থাৎ ষষ্ঠ দিন থেকেই নারী-পুরুষের সঙ্গে মিলনের জন্য আস্তে-আস্তে প্রস্তুত হতে থাকে। ঋতুকালে শাস্ত্র বা স্বাস্থ্য অননুমোদিত না হলেও রুচির কারণে সাধারণত কেউ নারীসঙ্গম করে না। একমাত্র যাঁরা ধর্মের নামে দেহসাধনা করেন তারাই ঋতুকালে নারীতে উপগত হন—যেমন বাউল সম্প্রদায়। এই ছ-দিনই সর্বোচ্চ ঋতুকাল এবং ছয়দিন থেকেই নারীদেহ প্রজনন বার্তা প্রচারে সক্ষম বলে গণ্য, এবং চোদ্দো দিন পর্যন্ত সে সেই বার্তা বহন করতে থাকে। সুপ্রাচীন কালের মানুষ জৈবিক অভিজ্ঞতা থেকে ছয় বা ষষ্ঠ দিবসই মানবীর উর্বরতার সূচনাকাল ধরে নিয়ে উর্বরতা দেবীর নাম দিয়েছে ষষ্ঠী। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়ম বা চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে ছয়দিনের পর থেকেই ডিম্বাণু নিষ্ক্রমণের (Ovulation) সম্ভাবনার সূচনাকাল আরম্ভ হয়ে যায় বলেই উর্বরতাবাদ ও শিশুরক্ষাকারী ষষ্ঠীদেবীর সৃষ্টি হয়েছে। এই কারণেই ষষ্ঠীদেবীর নাম সংখ্যাবাচক হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে।

বিভিন্ন ষষ্ঠীর ব্রতকথার একাধিক পাঠ পাওয়া যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদি কাহিনির সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য-সংশ্লেষের কারণে কাহিনি

ও চরিত্রের বদল ঘটে। যেমনটা স্পষ্ট দেখা যায় শীতলাষষ্ঠীর ব্রতের 'কথা'-য়। বর্তমানে বহুল প্রচলিত কথাটি হল—এক ছিল শীতুলি বামনি। তার সাত ছেলে, সাত বউ, ঘরকন্না করে। মাঘ মাস, বড্ড শীত। বামনি শেতলষষ্ঠী করবে বলে দই পেতে শিকেয় তুলে রাখেছে, সকালবেলা উঠে বামনির পূজোর কথা আর মনে নেই। সে বউদের বললে, আজ বড়ো শীত, আমায় গরম জল করে দাও, আমি নাইব। মাগুর মাছের ঝোল, মুগের পুলি আর গরম ভাত আমায় রেঁধে দাও, আমি খাব। বউয়েরা তাই করে দিলে, খেয়ে-দেয়ে বামনি যেই উঠতে যাবে অমনি শিকেতে দয়ের হাঁড়ি ছিল মাথায় ঠেকল। তখন বামনির পুজোর কথা মনে পড়ল, কী আর করবে, সেদিন লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে রইল। বউয়েরাও খেয়েদেয়ে শুল। সকালবেলা বামনি উঠে দেখে অনেক বেলা হয়ে গেছে, তখনও কেউ ওঠেনি। এ দোরে ঘা মারে, ও দোরে ঘা মারে, কোনো সাড়া শব্দ পেলে না। তখন পাড়ার লোকজন ডেকে এনে দরজা ভেঙে দেখে সাত ছেলে সাত বউ মরে রয়েছে। ইত্যাদি।

এই একই ব্রতের 'কথা'য় কৌমজীবনে পাঠটি ছিল আলাদা, সেখানে বামনি নেই, আছে বন— বামে বন, ডাইনে বন। চারিধারেই বন। এ-বন থেকে ও-বন ঘোরাফেরা করছে বাঘ ভালুক নেকড়ে শিয়াল। গাছে গাছে উড়ে এসে বসে চিল শকুনি। আমরা বেঁচে আছি মা ষষ্ঠীর দয়ায়। এই ষষ্ঠী মায়ের কাছে মানত করে ষাটুর মায়ের পেটে ষাটুর জন্ম। বাপ মায়ের চোখের মণি ষাটু। সেই ষাটুর একদিন বিয়া হল। ষাটু গেল শ্বশুরবাড়ি। এরপর সে পোয়াতি হল এবং ক্রমশ ষাটুর প্রসবের সময় হল।

ঘরের পাশেই বন। ষাটু নির্ভয়ে গাছপালা পাখপাখালি দেখতে দেখতেই প্রসব করল একটা মস্ত বড়ো লাউ। লাউটি দেখেই সে শাশুড়ির কাছে চলে এল। শাশুড়ি বউয়ের পেটের দিকে চেয়ে বলল, একি বৌ, তুই জাঁড় (জঠর বা গর্ভ) পেটে গেলি আর কুঁড় (ভাঙা) পেটে এলি যে। ষাটু বলল, ওই ধারে দ্যাখো যেয়ে একটা লাউ হয়েছে। শাশুড়ি ছুটে গিয়ে দ্যাখে, মস্ত বড়ো একটা লাউ শঙ্খচিলে ঠোকরাচ্ছে। ঠোকর খেয়ে লাউটি গেল দু-ভাগ হয়ে। শাশুড়ি দেখল লাউ-এর ভিতর টুকটুকে সুন্দর ব্যাটা ছেলে। একটা নয়, দুটো নয়। গুণে দেখল ষাটটি ছেলে। মা ষষ্ঠীর দয়ায় ষাটু হল ষাট বেটার মা। মা ঠাকুমার যত্নে ষাটছেলে জোয়ান হল। বিয়ে দিবার বয়স হল। ষাটু বলল, আমি একই দিনে যে মায়ের ষাটটি মেয়ে সেই মায়ের মেয়েগুলিকে বউ করব। কিন্তু ষাট-ষাটটি মেয়ে কোথায় পাবে ষাটুর সোয়ামী? তবু বেড়িয়ে পড়ল বনের পথে।—এইভাবে চলতে থাকে সে ব্রতকথা বনের পথে।

মাস বা ঋতু অনুযায়ী ষষ্ঠীর ব্রতকে সাজালে বাংলা বছরের প্রথমে জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে উদ্‌যাপিত হয় অরণ্যষষ্ঠী। মূলত বনে গিয়েই এ ব্রত পালনের কথা হলেও এখন বন কোথায়! তাই বনে যেতে না-পারলেও ঘরেই জোগাড়যন্ত্র করে সিঁদুর-মাখানো নোড়াকে মা ষষ্ঠী জ্ঞানে পুজো করতে বসে গাঁ-ঘরের বউ-ঝিরা। একটা পাখা, পাকা আম, দূর্বা, ছ-টি নতুন বাঁশ পাতা পুজোর সামগ্রী হিসেবে রাখে। ছয় কুড়ি ছ-গাছা দূর্বা আর বাঁশপাতাকে কলাগাছের আঁশ দিয়ে বাঁধলে তবেই এক গাছা দূর্বা হয়। পিটুলির বিচিত্র আলপনা দিয়ে তার ওপর পাখা, একটি পাকা আম ও এক আঁটি দূর্বা পুজোর জায়গায় সাজানো হয়।

পাখায় থাকে একটি সিঁদুরের ফোঁটা। একটি কলা, একটি সুপুরি, একটি পান দিয়ে তৈরি হয় এক ভাগ নৈবেদ্য। পুজোর আগে প্রত্যেক ব্রতী তেল না-মেখে (এদিন যে ওদের তেল-মাখা আর আমিষ খাওয়া বারণ) নিজেদের নির্দিষ্ট পাখা-আম-দুর্বার আঁটি নিয়ে পুকুরে বা নদীতে স্নান করে। বুক জলে দাঁড়িয়ে দূর্বার আঁটি দিয়ে নিজের চোখে জল ছেটায় আর বলে:

অগ্রহায়ণে মুলো ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
পৌষে লোটন ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
ফাল্গুনে গুণো ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
চৈত্রে অশোক ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
বৈশাখে দই ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
জ্যৈষ্ঠে অরণ্য ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
অরণ্যে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে
আষাঢ়ে চাপড়ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
ভাদ্রে অক্ষরা ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
আশ্বিনে বোধন ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
কার্ত্তিকে শ্মশান ষষ্ঠী, ষাট ষাট ষাট
শ্মশানে গেলেও ঝি পুত ফিরে আসে

প্রত্যেকবার ষাট ষাট ষাট বলার পর দূর্বা ছিটিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে নিজ সন্তানের মঙ্গল কামনায় চোখ বন্ধ করে পূজারিণী, মনে-মনে গৃহদেবতার নামও জপে নেয়, ছেলে-মেয়ে-বউদের নামও বিড়বিড় করে—সকলের মঙ্গল হোক, সবাই সুস্থ থাকুক।

(সাধারণত শিশু সম্পর্কে কোনো অশুভ-অমঙ্গলজনক কথা উচ্চারণ করলে তা যা-তে না-ফলে, সেই জন্য দেবী ষষ্ঠীর নাম উচ্চারণ করা হয়। এই ষষ্ঠী দেবীই উচ্চারণের সুবিধার্থে 'ষাট ষাট'—কখনো বা 'বালাই ষাট' রূপে উচ্চারিত হয়। মূলত শিশু বিষম খেলে বা তার মৃত্যুজনিত অমঙ্গলজনক কথায় এই কথাগুলি বেশি উচ্চারিত হতে দেখা যায়।)

তারপর মন্ত্র-পড়া শেষ হলে বায়না-বদল করে, মানে সামনে রাখা ডালার আম-কলা-সুপুরি সব এক-এক ভাগ করে তুলে নিয়ে দিতে থাকে গ্রাম-ঘর থেকে একসঙ্গে অরণ্যষষ্ঠীর ব্রত করতে আসা বউ-ঝি-দের মধ্যে। ননদ ভাজকে দেয়, জা অন্য জা-কে দেয়, না শাশুড়ি আর বউতে বায়না-বদল চলে না—তাদের থাক ভিন্ন যে।

বায়না-বদল হয়ে গেলে সিঁদুর-মাখানো নোড়ার চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে থাকে আর ছড়া বলে চাল ছেটায় নোড়ার ওপর:

নিজ পেটে নাই এলো-মেলো, ষাট ষাট ষাট
বৌর পেটে নাই এলো-মেলো ষাট ষাট ষাট
ঝির পেটে নাই এলো-মেলো ষাট ষাট ষাট।

এরপর বাড়ির সব ছেলে-মেয়ে ও অন্য সকলের গায়ে দুর্বার আঁটি দিয়ে জল ছেটাতে-ছেটাতে বলতে থাকে: "জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীপুজো, ষাট ষাট ষাট।" কারণ সংসারের সকলের শুভকামনায় তারা এই ব্রত পালন করে। ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করে পড়া শুরু হয় এই ব্রতের 'কথা'। এ বঙ্গে সর্বাধিক প্রচলিত আশুতোষ মজুমদারের *মেয়েদের ব্রতকথা* অনুসারে 'কথা'টি এইরকম:

এক দেশে এক বামনি ছিল, তার তিন ছেলে আর তিন বউ ছিল। ছোটো বউয়ের বড়ো নোলা, সে সব জিনিস চুরি করে খেত, আর বাড়ির কালো বেড়ালের নামে দোষ দিত। সেই বেড়াল ছিল মা ষষ্ঠীর বাহন, সে রোজ রোজ মা ষষ্ঠীকে গিয়ে বলে দিত।

কিছুদিন পরে ছোটো বউ পোয়াতি হল। দশ মাস দশ দিনে একটি চাঁদের মতো ছেলে হল। রাত্রে ছেলে কোলে করে ছোটো বউ শুয়ে ছিল, সকালবেলা উঠে দেখে ছেলে নেই। তখনি সকলে চারিদিকে খুঁজল, কিন্তু ছেলে কোথাও পাওয়া গেল না।

এমনি করে ছোটো বউয়ের সাত ছেলে আর এক মেয়ে হল, কিন্তু সবই গেল হারিয়ে, খুঁজে আর পাওয়া গেল না। বাড়ীতে সবাই ছোটো বউকে রাক্ষসী বলতে লাগল। ছোটো বউ তাই শুনে, মনের দুঃখে ও ঘেন্নায় বনে চলে গেল।

বনে বসে-বসে ছোটো বউ খুব কাঁদছে, দেখে মা ষষ্ঠীর বড়ো দয়া হল। তিনি বুড়ি বামনির বেশ ধরে ছোটো বউকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুই কাঁদছিস্ কেন মা, তোর কী হয়েছে?"

ছোটো বউ বল্লে, "মা! আমি বড়ো পাপিষ্ঠা, আমার সাত ছেলে আর এক মেয়ে হয়েছিল, তার একটিও নেই। সংসারে সকলেই আমায় ঘেন্না করে, সেই জন্যে বনে এসেছি।"

মা ষষ্ঠী বল্লেন, "ও আবাগির বেটি, তুই সব জিনিস চুরি করে খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দিতিস কেন? সেই জন্যেই তো আমার বেড়াল তোর ছেলেদের নিয়ে আমাকে দিয়েছে।"

তখন ছোটো বউ কাঁদতে-কাঁদতে মা ষষ্ঠীর পা জড়িয়ে ধরে বলল, "মা, ক্ষমা কর, আর কী করে আমার পাপের খণ্ডন হবে

তা বল।" মা ষষ্ঠী তখন বললেন, "যা, ওই ওখানে একটা মরা, পচা বেড়াল পড়ে আছে; এক হাঁড়ি দই এনে, ওই বেড়ালটার গায়ে ঢেলে দিয়ে, জিবে করে আবার হাঁড়িতে তুলে নিয়ে আয়। তবে তোর ছেলে পাবি।" ছোটো বউ ছেলের লোভে তাই করলে। তখন মা ষষ্ঠী তার ছেলেদের আর মেয়েকে এনে দিলেন, দিয়ে বল্লেন, "এদের কপালে এই দইয়ের ফোঁটা দাও। আর কখনও চুরি করে খেয়ে বেড়ালের নামে দোষ দিয়ো না, বেড়ালকে লাথি মেরো না, ছেলেদের বাঁ হাতে মেরো না, মর বলে গালাগালি দিও না, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে পিটুলির কালো বেড়াল গড়ে, পিটুলির কঙ্কণ গড়ে, ফলমুলের বাটা সাজিয়ে, ছ-টা পান, ছ-টা সুপারি, ছ-টা কলা আর বাঁশপাতায় হলুদের নেকড়া জড়িয়ে, ছ-গাছা সুতো পাকিয়ে তাতে বাঁধবে; এই সুতোকে ষাট-সুতো বলে। তারপর তেল-হলুদ দিয়ে অরণ্যষষ্ঠীর পুজো করবে। পুজোর পর সেই ষাট-সুতো প্রত্যেক ছেলের কপালে ছুঁইয়ে ডান হাতে বেঁধে দেবে। তারপর ব্রতকথা শুনে ফলমূল কিংবা ফলার খাবে, ভাত খেয়ো না। এই সব কল্লে পোয়াতিদের ছেলেপিলে মরে না।" এই কথা বলেই মা ষষ্ঠী চলে গেলেন।

তখন, ছোটো বউ ছেলে-মেয়ে নিয়ে ঘরে এল, এসে সবাইকে এই সব আশ্চর্য কথা বলল। সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল। তখন সব জায়েরা ছোটো বউয়ের কাছ থেকে ষষ্ঠীর পুজোর নিয়ম জেনে নিলে, তারপর থেকে তারা নিয়মিত ষষ্ঠীর পুজো করতে লাগল। পরে, ছোটো বউ ছেলে-মেয়েদের খুব ঘটা করে বিয়ে দিয়ে বউ-জামাই আনলে, জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীর দিন জামাইয়ের কপালে দইয়ের ফোঁটা দিয়ে আম-কাঁঠালের বাটা দিল।

তারপর অন্য অন্য বউয়েরও ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই ঘরে আনলে। ক্রমে ওই দিনটা জামাই-ষষ্ঠী বা ষষ্ঠী-বাটার দিন হয়ে উঠল।

ছোটো বউয়ের চারিদিকে সুখ্যাতি হতে লাগল। সবাই অরণ্যষষ্ঠীর পুজো করতে লাগল।

ব্রতকথা শেষ হলে সবাই গলায় আঁচল জড়িয়ে ষষ্ঠীদেবীকে প্রণাম করে এবং নোড়া কপালে-বুকে ঠেকিয়ে বলে:

হয়ে পুত্র মরবে না।
চোখের জল পড়বে না।।

ব্রতের এই 'কথা'র স্থানভেদে আছে ভিন্ন রূপ। সেটা থাকাই স্বাভাবিক, কিন্তু বামুনে আগ্রাসনের নমুনা হিসাবেও এর আছে বিভিন্ন রূপ। উদ্ধৃত আশুতোষ মজুমদারের সর্বাধিক প্রচলিত *মেয়েদের ব্রতকথা*ও এর বাইরে নয়, এর প্রতি ছত্রে-ছত্রে পাওয়া যাবে সে-নমুনা, যা পূর্বে উল্লেখিত অবনীন্দ্রনাথের কথাকে সর্বাংশে সমর্থন করবে। ষষ্ঠীর ব্রতকথা অংশে আটটির মধ্যে পাঁচটি শুরু হয়েছে গরিব বামনি বা বামুনের প্রসঙ্গ দিয়ে, যা কখনই আদিরূপ হতে পারে না, অন্যান্য অনেক ব্রতের মতোই গরিব বামুন পুজো করে দিয়ে দান প্রাপ্তির আশায় যে বদল ঘটান তাকে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব, কিন্তু ব্রতকথা অংশের বদল যা সেই কোন্ কাল থেকে সাধারণ গ্রামবাসী মহিলাদের মাঝে স্মৃতি মাধ্যমেই বাহিত, তার দূষণ যে ছাপার যুগের অবদান এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত *মেয়েদের ব্রতকথা* বইটির অ্যাখ্যাপত্র দেখলেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যাবে। সেখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে দামি শাড়ি-

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক প্রাইজ, লাইব্রেরী ও জনশিক্ষার জন্য অনুমোদিত।

মেয়েদের ব্রত-কথা

লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, চণ্ডী, কুমারী-ব্রত, সধবা-ব্রত, জিতাষ্টমী, মনসা-ব্রত প্রভৃতি বহুবিধ প্রয়োজনীয় ব্রত সম্বলিত।

আশুতোষ মজুমদার
প্রণীত

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড

গহনা পরিহিতা এক ভদ্রমহিলাকে বিষ্ণু বা নারায়ণকে প্রণামরত অবস্থায়! ভিতরে বর্ণিত মেয়েলি ব্রতকথাগুলোতে কিন্তু বিষ্ণু বা নারায়ণকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, একমাত্র 'হরির চরণ' নামক প্রায় অপ্রচলিত ব্রতটির হরিকে নারায়ণ ধরে নিলেই সে-টা সম্ভব। সে ব্রতের উদ্‌যাপনের সময়, "সোনার, রূপার ও তামার তিন জোড়া চরণ গড়াইয়া পূজা করিবে। তারপর তিনটি বামুনকে খাওয়াইয়া প্রত্যেককে ওগুলি দিবে, আর কাপড়, গামছা দক্ষিণা দিবে।" —ব্যাখ্যা নিস্প্রয়োজন।

এছাড়াও আমাদের সামনে নমুনা হিসাবে রয়েছে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনের বাল্যসুহৃদ অনুজপ্রতিম শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় সংকলিত, *মেয়েলি ব্রত ও কথা, অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গের যোষিৎ - প্রচলিত কতিপয় ব্রতের বিবরণ* এবং শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত সংকলিত *ব্রতমালা*। এই দু-টি বইতে শ্রীআশুতোষ মজুমদারের 'বামনি' ও 'বামুন' হয়ে উঠেছে 'ব্রাহ্মণ' ও তার 'ব্রাহ্মণী'! সমস্ত ব্রতকথার ভাষা অধিকতর সাধু, অথচ উহা সংকলিত! আগে উল্লেখিত অরণ্যষষ্ঠীর ছড়াটি আমরা পরমেশপ্রসন্ন রায়ের সংকলন থেকে নিয়েছি, সেখানে বারোমাসে বারোটি ষষ্ঠীর নাম আছে যা আশুতোষ মজুমদারের সংকলনের থেকে কিছু আলাদা। যেমন তিনি বলছেন, "বার মাসে ষষ্ঠী পূজার প্রথা আছে; কিন্তু আমাদের দেশে বৈশাখ, আষাঢ়, কার্ত্তিক ও ফাল্গুন মাসে ষষ্ঠীর পূজা করে না, তবে সাট্ দিবার সময় সকলেই বার মাসের নাম করিয়া থাকেন। যেমন:

বৈশাখ মাসে— ধুলো সাট্
আষাঢ় মাসে— কোঁড় সাট্

কার্ত্তিক মাসে— গোট্ সাট্

ফাল্গুন মাসে— অশোক সাট্

লক্ষনীয় বিষয়টি হল, এর মধ্যে তিনটি নাম খাঁটি দেশজ শব্দ, এবং এখানে 'ষাট' নয় শব্দটি 'সাট্'। এ প্রসঙ্গে ডি ডি কোসাম্বির পূর্বোল্লেখিত বক্তব্য স্মরণযোগ্য। বিস্তারিত ব্যাখ্যায় না-গিয়ে আমরা অরণ্যষষ্ঠীর অপর দু-টি ব্রতকথা পাঠকের সামনে তুলে দিচ্ছি, আশা রাখি তাঁরা প্রদর্শিত পথানুযায়ী সেগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হবেন।

শ্রীপরমেশপ্রসন্ন রায় সংকলিত অরণ্যষষ্ঠীর ব্রতকথাটি এইরকম:

এক যে ছিল ব্রাহ্মণ, তার ব্রাহ্মণীর প্রত্যেকবার সন্তান হওয়ার পর মা ষষ্ঠীর কালো বেড়াল সে-সন্তানকে মুখে করে ষষ্ঠীঠাকরুনের কাছে নিয়ে চলে যেত। ব্রাহ্মণের দুঃখের শেষ ছিল না—সন্তানই যদি না-বাঁচে তবে সংসারে সুখটা কোথায়। তার বড়ো জানার ইচ্ছা হল তার বা ব্রাহ্মণীর দোষটা কী। একদিন যে তাই ঠিক করল পাহাড়ে-জঙ্গলে যেখানে মা ষষ্ঠীর বাস সেখানে যাবে, খুঁজে বের করবে তাঁকে। জানাবে তাদের কষ্টের কথা। আর যদি তাঁকে খুঁজে না-পায় তবে আবার ফিরে আসবে দুঃখের বোঝা কাঁধে করে। সেই লক্ষ্যে একদিন সে ব্রাহ্মণীকে একা ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়ল দেবীর উদ্দেশে।

পথে যেতে-যেতে প্রথমে তার দেখা হল এক গাইগোরুর সঙ্গে। সে জানতে চাইল ব্রাহ্মণ কোথায় যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ নিজের দুঃখের কথা বলে তার ষষ্ঠী ঠাকরুনের কাছে যাওয়ার কথা জানাল। সে-কথা শুনে গাইগোরু বলল, "ঠাকুর, আমারও

বড়োই দুঃখ। আমার এত দুধ, তা মানুষেও নেয় না, বাছুরেও খায় না। বাঁটের ব্যথায় আমি অস্থির। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমার দুঃখের কথাটাও ষষ্ঠীঠাকরুনকে বলো।"

জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ রোদের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে ক্লান্ত ব্রাহ্মণ যখন একটা আম গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করছিল, তখন গাছটি বলল, "ঠাকুর, তুমি কোথায়, যাচ্ছ?" ব্রাহ্মণ তার গন্তব্যের কথা জানালে গাছ তাকে বলে, "ঠাকুর গো আমার কী গতি হবে? আমার এত ফল ঝুলছে, কিন্তু তা মানুষেও নেয় না, ঝড়েও পড়ে না, কাকেও খায় না। আমি বোঁটার ব্যথায় অস্থির। তুমি আমার কষ্টের কথাটা ষষ্ঠীঠাকরুনকে বলো।"

এরপর তার দেখা হল এক কাঠকুড়ুনি মেয়ের সঙ্গে। তার মাথায় এক বোঝা কাঠ ও খড়। সে বলল, "দাদাঠাকুর, আমার মাথায় দেখো কত কাঠ আর খড়। কেউ এগুলো কেনে না। তাই আমার মাথা থেকে বোঝা আর নামে না। তুমি আমার দুঃখের কথাটাও ষষ্ঠীঠাকরুনকে বলো।"

পথে আবার ব্রাহ্মণের দেখা হল এক এক মেয়ের সঙ্গে, তার মাথায় এক মালসা চুন। সে বলে, "আমার চুন কেউ কেনে না, আর এই মালসার ভার তাই আমায় মাথায় করে বইতে হয়। আমার কথাটাও তুমি ষষ্ঠীঠাকরুনকে বলতে ভুলো না যেন।"

এরপর তার দেখা হল এক দুখিনী মায়ের সঙ্গে, সে এক পা ঢেঁকির ওপর দিয়ে অন্য কোলে বাচ্চা নিয়ে কাজ করে চলেছে। ব্রাহ্মণকে দেখে সে বলে, "দেখো ঠাকুর, আমার কী কষ্ট। আমি না-পারি ঢেঁকি থেকে পা নামাতে, না-পারি কোল থেকে ছেলে নামাতে। আমার কী হবে গো ঠাকুর?

তোমায় গড় করি, তুমি আমার কথা ষষ্ঠী ঠাকরুনকে বলতে ভুলো না যেন।”

একে-একে নিজের দুঃখ তো বটেই, সঙ্গে গোরু-গাছ ও অন্যান্য মানুষদের দুঃখর বোঝা নিয়ে বহু খোঁজ করে ব্রাহ্মণ একদিন উপস্থিত হল এক মস্ত বড়ো বনে মা ষষ্ঠীর সামনে। অপরূপা দেবীর চাঁদপানমা মুখ, সোনার বরণ অঙ্গ, সিঁথিতে সিঁদুর, মুখে পান, গায়ে হীরে-মানিক, কোলে টুকটুকে ছেলে। তাঁর সোনার খাটে গা, রুপোর খাটে পা, চারদিকে বইছে শ্বেত চামরের বাতাস।

ব্রাহ্মণ প্রণাম করে তাঁর সামনে করজোড়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, “তুমি এসেছ কেন আমি জানি। তোমার ব্রাহ্মণী সন্তানের ঠিকমতো আদর-যত্ন করে না। প্রতিজ্ঞা করো এবার থেকে সন্তানের ঠিকঠাক যত্ন করবে, গায়ে হাত তুলবে না, ষাট সোনা বলে আদর করবে, আহ্লাদ করবে—তবেই তোমাদের কাছে ছেলে থাকবে, নাহলে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।”

ব্রাহ্মণ দেবীর কথা মেনে নেয়। তাপরপর সে একে-একে অন্যদের সমস্যার কথা বলতে থাকে। তার উত্তরে ষষ্ঠীঠাকরুন বলেন যে, গাইটি দেবসেবার জন্য দোয়ানো দুধ চুরি করেছিল, তাই আজ ওর এই দশা। ও যদি কোনো ব্রাহ্মণকে দুধ ছেড়ে দেয় তবেই ওর অবস্থার উন্নতি হবে।

আমগাছটি দেবসেবার জন্য একবার একজন বামুন একটা আম নিতে এলে আমটির বোঁটা শক্ত করে ধরে রেখেছিল বলে আজ ওর দুর্দশা। একজন বামুনকে ও সব ফল দিক, ওর অবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।

কাঠকুড়ুনি মেয়েটার একজনের মাথায় খড়কুটো দেখেও কিছু বলেনি এই কষ্ট। ও এক ব্রাহ্মণকে সব খড়-কাঠ দিয়ে দিক, তা-লেই যন্ত্রণা মুক্ত হবে। তেমনই চুনওয়ালি একজনের মুখে চুনের দাগ দেখে কিছু বলেনি বলে এত কষ্ট পাচ্ছে। ও একজন ব্রাহ্মণকে চুনের মালসা দিয়ে দিলে ওর ভালো হবে। আর বাচ্চা কোলে ওই আবাগি এক বামুনের বাড়ি কাজ করত। খালি ফাঁকি দিত কাজে কাজে। তাই ওকে এত কষ্ট পেতে হচ্ছে। আগে এক বামুনের বাড়ি ও মন দিয়ে কাজ করুক, তবেই ওর মুক্তি।

ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীঠাকরুনকে প্রণাম করে বিদায় নিল। ফেরার পথে একে-একে সকলকে তাদের দোষ আর মুক্তির উপায় বলতে-বলতে চলল নিজের বাড়ি। বাড়ি ফিরে ব্রাহ্মণীকে জানাল সব। একদিন তাদেরও ফুটফুটে ছেলে হল। ছেলেকে তারা সবসময় বাবা-বাছা-সোনা বলে আদর করত। দোষ করলেও কিছু বলত না। একবার এক নাপিতের কান সে কেটে দিলে নাপিতকে কিছু টাকা দিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে তারা নিল। আর ছেলেকে কোলে টেনে নিল। ধীরে-ধীরে ছেলে বড়ো হল। বিয়েও হল তার। বিয়ের পর সে মিছিমিছি বউকে খুব মারলেও বউ বলে:

কোনো দুঃখ নাই মনে শ্বশুর-নন্দন।
তোমারি প্রসাদে শাঁখা সিন্দু চন্দন।।

কিন্তু বিপত্তি যেন তার জন্য অপেক্ষা করছিল। এক ষষ্ঠীপুজোর দিন সে মা-র কাছে তেল চাইলে মা তাকে তেল দেয় না, কারণ ষষ্ঠীপুজোর দিন মাখতে নেই, আমিষ খেতে নেই। তার বানির লোক কেউ তেল না-দিলে সে শ্বশুরবাড়ি চলে যায় মনের দুঃখে। সেখানে তার দারুণ খাতির। জামাই নাইতে যাবে বললে বাড়ির

লোকজন তার মন ঘুরিয়ে দিতে উপাদেয় খাবার এনে দেয়। কিন্তু সে গোঁ ধরে বসে, স্নান না-করে কিছুই খাবে না। তখন তেলের বদলে তাকে মধু দেয়। কিন্তু জামাই কলুর বাড়ি থেকে ভাঁড় ভেঙে তেল নিয়ে এসে মাখে। তেল মেখে সে সরাসরি হাজির হয় ষষ্ঠী ঠাকরুনের কাছে। মা ষষ্ঠী তখন বলেন যে, তাকে কেউ বাড়িতে তেল না-দিলেও সে জোর করে নিজের ইচ্ছায় তেল মেখেছ— তাই দোষ তার। ষষ্ঠীঠাকরুনের কথা শুনে তার বোধোদয় হয়। সে বাড়ি ফিরে আসে। আর মতি ফেরায় তার বিদ্যে-বুদ্ধি সব হয়। এরপর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী ছেলে-বউ-নাতি-নাতনি নিয়ে সুখে ঘর করতে থাকে।

শ্রীরামপ্রাণ গুপ্ত অরণ্যষষ্ঠীর যে ব্রতকথাটি তাঁর *ব্রতমালা* গ্রন্থে অন্তর্ভূক্ত করেছেন তার 'কথা' ভিন্ন, ভাষা সাধু:

এক ব্রাহ্মণের বাড়ির পাশেই ছিল এক গোয়ালার বাড়ি। ব্রাহ্মণের স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা, তিনি কোনো ব্রত নিয়ম করিতেন না। একমাত্র গৃহদেবতা শালগ্রামই ছিলেন তাঁহার উপাস্য। গোয়ালার সাত বেটা, সাত বউ; নাতিনাতনির কলরবে তাহার বাড়িতে কান পাতা যাইত না। গোয়ালিনী তাদের মঙ্গল কামনায় সবরকম ব্রত নিয়ম করিত।

জ্যৈষ্ঠ মাস, আমষষ্ঠীর দিন। গোয়ালিনী সাত বউ আর নাতি-নাতনীর দল নিয়া স্নান করিতে যাইল। তাহাদের ঝাঁপাঝাঁপিতে জল ঘোলা হল, ঘাট পিছল হল। গোয়ালিনী স্নান করিয়া উপরে উঠিল, এমন সময় সেই ব্রাহ্মণী স্নান করিতে জলে নামিলেন আর তিনি পিছলে পা সামলাইতে পারিলেন না, আছাড় খাইলেন। শরীরে বড়ো ব্যথা পাইলেন, কোন্ আঁটকুড়ি ঘাট পিছল করিয়াছে

বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। গোয়ালিনীও রাগিয়া গিয়া বলিল, নাতিনাতিনিতে আমার ঘর ভরা, আর আমি আঁটকুড়ী? তুমি সন্তানের মুখ দেখনি, তবে তুমি কী? গোয়ালিনীর কথা শুনে ব্রাহ্মণী মনে বড়ো কষ্ট পাইলেন, অভিমানে ঘরে এসে বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। কাঁদতে-কাঁদতে দুই চোখ ফুলিয়া উঠিল। এমন সময় ব্রাহ্মণ আসিয়া খাইতে চাহিল। ব্রাহ্মণী উঠিলেন না, স্বামীকে দেখিয়া অভিমানে আরও ফুলিয়া ফুলিয়া কঁদিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে তাঁহার অভিমানের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণী সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন, সন্তান-কামনায় ষষ্ঠীদেবীকে প্রসন্ন করিতে সংকল্প করিলেন, বলিলেন, ভোগের জন্য আমাকে কিছু জিনিস দেও, আমি ষষ্ঠী দেবীর উদ্দেশে যাইব। ব্রাহ্মণী এক হাঁড়ি মনোহরা তৈয়ার করিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া ষষ্ঠীর উদ্দেশে চলিলেন। পথে গোয়ালিনীর সঙ্গে দেখা হইল। গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশে, পাই ষষ্ঠী, আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী, হবে ব্রহ্মবধ। গোয়ালিনী ষষ্ঠীর নাম শুনিয়া তাড়াতাড়ি ঘরে গেল, ফিরিয়া আসিয়া দেবীর জন্য পান সুপারী ব্রাহ্মণের হাতে দিল। ব্রাহ্মণ পান সুপারী কাপড়ের কোণে বাঁধিয়া লইয়া চলিলেন। পথে এক চুনিয়ার সঙ্গে দেখা হইল। তাহার মাথায় ছিল এক হাঁড়ি চুন। তাহার চুন কেহ কিনে না, চুনের হাঁড়ি আর মাথা হইতেও নামে না। চুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ উত্তর করিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। চুনিয়া বলিল, ঠাকুর, দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন,

কবে আমার এ যন্ত্রণা ঘুচিবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। কিছু দূর গেলে আর এক জন লোকের সহিত ব্রাহ্মণের দেখা হইল। তাহার মাথায় কাঠের বোঝা। এ কাঠ কেহ কিনে না, মাথা হইতেও নামে না, আঁটিয়া ধরিয়া রহিয়াছে। কাঠুরিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। কাঠুরিয়া বলিল, ঠাকুর, দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কবে আমার মাথা হইতে কাঠের বোঝা নামিবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি আর কিছু দূরে গিয়া দেখিলেন, পথের ধারে একটা আমগাছ। গাছে আম পাকিয়া লাল টুকটুকে হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু সে আম পড়েও না, কেহ পাড়েও না। গাছ ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। গাছ তাহার কথা শুনিয়া বলিল ঠাকুর, আমি আর এ ভার সহিতে পারি না। দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কবে এই ভার খসিয়া পড়িবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। তিনি কিছু দুর আসিয়া দেখিতে পাইলেন, পথের ধারে এক পুকুর, পুকুর দলে দামে পূর্ণ, পুকুরের জল কেহ পান করে না। পুকুর জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, কোথায় যাওয়া হচ্ছে ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, ষষ্ঠীর উদ্দেশে, পাই ষষ্ঠী আসব ঘর, না পাই ষষ্ঠী হবে ব্রহ্মবধ। পুকুর বলিল, ঠাকুর, দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, কবে আমার এ অবস্থা ঘুচিবে, জল নির্ম্মল হইবে, লোকে পান করিবে। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করিতে স্বীকার করিলেন। অবশেষে ব্রাহ্মণ ষষ্ঠীর দেশে আসিলেন।

দেবী সোনার খাটে বসিয়া আছেন, রূপার খাটে পা। চারিদিকে পড়িতেছে শ্বেত চামরের বা ব্রাহ্মণ দেবীকে দেখিয়া তাহার সম্মুখে মিঠায়ের হাঁড়ি রাখিলেন। ভক্তের মন বুঝিয়া দেবী বলিলেন, তোমার কাপড়ের কোণে কি বাধা আছে, আগে তাহাই দেখাও তার পর মিঠাইয়ের হাঁড়ি খুলিও। ব্রাহ্মণ তাহার হাতে গোয়ালিনীর দেওয়া পান সুপারী দিলেন, তারপর হাঁড়ি খুলিয়া মিঠাই দেখাইলেন। দেবী মিঠাই দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি মনে করি আসিয়াছ? ব্রাহ্মণ বলিলেন, আমি সন্তান চাই। গোয়ালিনী আমার ব্রাহ্মণীকে আঁটকুড়ী বলিয়া গালি দিয়াছে, ব্রাহ্মণীর আঁটকুড়ী নাম ঘুচাইয়া দিতে হইবে। দেবী বললেন, অন্য বর তোমাকে দিতে পারি। বিধাতা তোমার কপালে সন্তান লেখেন নাই, আমি করিব কি? দেবীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণের চক্ষুস্থির হইল। তিনি বলিলেন, আমি আপনার দ্বারে হত্যা দিলাম, হয় সন্তান লাভ করিব, না হয় প্রাণপাত করিব। আপনার দ্বারে আজ ব্রহ্মহত্যা ঘটিবে। দেবী তাহার কথা শুনিয়া ফাঁফরে পড়িলেন, বলিলেন, কপালে তোমার সন্তান লেখা নাই, আমার সাধ্য কী? গোয়ালিনী ছয় ষষ্ঠী তৈয়ার করিয়া পূজা করিতেছে। গোয়ালিনী যদি তোমাকে তার এক ভাগ ষষ্ঠ দেয় অরি তোমার ব্রাহ্মণী মন প্রাণে পূজা করে, তবেই তোমরা সন্তানের মুখ দেখিতে পাইবে। নচেৎ আর উপায় নাই। ব্রাহ্মণের নিজের কাজ শেষ হইল। তখন তিনি পুকুর, আম গাছ, কাঠুরিয়া ও চুনিয়ার দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। দেবী সব কথা শুনিলেন, কী করিলে তাহাদের দুঃখ ঘুচিবে, বলিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ দেবীকে প্রণাম করিয়া বিদায় লইলেন। ব্রাহ্মণ পুনরায়

পুকুরের ধারে আসিলেন, পুকুর তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা কি মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হাঁ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তুমি এক ব্রাহ্মণকুমারীকে লুকাইয়া রাখিয়াছ। সেই পাপে তোমার এ দুর্দশা; সুব্রাহ্মণকে কন্যাদান কর, তোমার সমস্ত পাপ ঘুচিবে, দল দাম অদৃশ্য হইবে, জল নির্মল হইবে, লোকে জল পান করিবে। পুকুর তাহার কথা শুনিয়া বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আপনি অনুগ্রহ করুন। ব্রাহ্মণ স্বীকার করিলেন। এক দেবী পুকুর হইতে উঠিলেন, তাঁহার রূপে চারি দিক আলো হইল। ব্রাহ্মণ তাহার সহিত মা সম্বন্ধ পাতাইলেন, তারপর তাহাকে সঙ্গে লইয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইলেন। ব্রাহ্মণ আমগাছের নিকট আসিয়া পৌঁছাইলেন। আমগাছ তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা কি মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এক ব্রাহ্মণ কুমার তোমার আম পাড়িতে উঠিয়াছিলেন, তিনি পড়িয়া মারা গিয়াছেন। সেই পাপে তোমার এ দুর্দশা। একজন সুব্রাহ্মণকে কিছু আম দান কর, তোমার পাপ ঘুচিবে, সকলে আম পাড়িয়া খাইবে। গাছ বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আপনি আম গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণের অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছিল, মেয়েটারও কিছু খাওয়া হয় নাই। ব্রাহ্মণ আম লইয়া নিজে পেট ভরিয়া খাইলেন, মেয়েটীকেও খাওয়াইলেন। তখনি দেশের যত লোক গাছের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল; মুহূর্ত মধ্যে সমস্ত আম ফুরাইয়া গেল; ব্রাহ্মণ সেখান হইতে রওনা হইলেন। কিছুক্ষণ পরে কাঠুরিয়ার

সঙ্গে দেখা হইল। সে ব্রাহ্মণকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন হাঁ, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। একটী লোকের মাথায় কুটা পড়িয়াছিল, তুমি তাহা দেখিয়া ফেলিতে বল নাই, সেই পাপে তোমার এ দুর্দশা। একজন সুব্রাহ্মণের কিছু কাজ করিয়া দাও, তোমার পাপ ঘুচিবে, কাঠের বোঝা নামিয়ে, লোক কাঠ কিনিবে। কাঠুরিয়া বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আমি আপনারই কিছু কাজ করিয়া দিব। এই কথা বলিতে না বলিতে তাহার কাঠের বোঝা নামিয়া গেল, লোকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার এক পয়সার কাঠ চার পয়সা দিয়া কিনিল। ব্রাহ্মণ কাঠুরিয়াকে সঙ্গে লইয়া আবার চলিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কিছুদূর আসিয়াই চুনিয়াকে দেখিতে পাইলেন। চুনিয়া তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ঠাকুর, আমার কথা কি মনে করিয়া দেবীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন? ব্রাহ্মণ বলিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। একটি লোকের ওষ্ঠে চুন লাগিয়াছিল, তুমি তাহা দেখিয়াও মুছিতে বল নাই। সেই পাপে তোমার এই দুর্দশা। একজন সুব্রাহ্মণকে কিছু চুন দান কর, চুনের হাড়ি মাথা হইতে নামিবে, লোকে তোমার চুন কিনিবে। এই কথা শুনিয়া চুনিয়া বলিল, সাত ব্রাহ্মণে আপনি ব্রাহ্মণ, কোথায় পাব আর ব্রাহ্মণ? আপনি কিছু চুন গ্রহণ করুন। ব্রাহ্মণ কিছু চুন নিলেন, চুনের হাঁড়ি তখনি মাথা হইতে নামিল; দেখিতে দেখিতে বহু লোক জুটিয়া পড়িল, চোখের পলকে সমস্ত চুন বিকাইয়া গেল। ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকুমারী এবং কাঠুরিয়াকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিলেন। বাড়ীতে পা দিয়াই ব্রাহ্মণীকে সমস্ত কথা খুলিয়া

বলিলেন, তার পর কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া গোয়ালিনীর বাড়ী গেলেন, তাহাকে সমস্ত খুলিয়া বলিয়া একভাগ ষষ্ঠ চাহিলেন। গোয়ালিনী প্রথমে কিছুতেই স্বীকার করিল না, পরে ব্রাহ্মণের অনেক কাকুতি মিনতিতে থাকিতে না পারিয়া তাহাকে এক ভাগ ভাঙ্গা ষষ্ঠী দিল। ব্রাহ্মণী ষষ্ঠী ঘরে আনিয়া মনপ্রাণে পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। পূজার ফলে তিনি এক কন্যা পাইলেন, তাহার রূপের ছটায় গৃহ উজ্জ্বল হইল। কন্যা ক্রমে বড় হইল; ব্রাহ্মণী তাহাকে বিবাহ দিয়া ঘরজামাতা রাখিলেন। কিছুদিন পরে কন্যা সন্তান সম্ভাবনা হইল। দশ মাস দশ দিন গত হইল, তিনি একটা চামড়ার থলে প্রসব করিলেন। ব্রাহ্মণী বড়ই মনস্তাপ পাইলেন, কিন্তু কী করিবেন, থলেটা আঁস্তাকুড়ে ফেলিয়া দিলেন। অসংখ্য কাকে আসিয়া উহা ছিঁড়িয়া ফেলিল। একবারে ষাটটা ছেলে থলের ভিতর হইতে বাহির হইল। ব্রাহ্মণী যাট নাতি কোলে করিয়া ঘরে আসিলেন। তাহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। তিনি বড় যত্ন করিয়া তাহাদিগকে লালন পালন করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিনে ষাট নাতিরই বিবাহ হইল। ব্রাহ্মণী আহ্লাদে গলিয়া পড়িলেন; নাতিবউদের কাজ করিবার অন্য ষাটজন দাসী রাখিয়া দিলেন, দুধের জন্য ষাটটা গাই কিনিলেন। একদিন শাশুড়ী বউদের হাতের পাক খাইতে চাহিলেন। সেদিন ষষ্ঠী। তিনি বউদিগকে নিরামিষ রাঁধিতে বলিলেন। দৈবক্রমে মাঝিরা একটা প্রকাণ্ড চিতল মাছ আনিল। বউরা ভাবিল, এমন সুন্দর মাছ থাকিতে শাশুড়ীকে কেন নিরামিষ রাঁধিয়া দিব। তাহারা পরিপাটী করিয়া চিতল মাছের ঝোল রাঁধিল। শাশুড়ী বউদের হাতের পাক দেখিয়া আহ্লাদে আটখানা হইলেন, সেদিন যে ষষ্ঠী,

আমিষ খাইতে নাই, তাহা ভুলিয়া গেলেন; তিনি মাছের ঝোল খাইলেন। দেবী অনিয়ম দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। ষাট নাতি একবারে ঢলিয়া পড়িল। সকলে শোকে হাহাকার করিতে লাগিল। গোয়ালিনী বলিল, ষষ্ঠীর দিন আমিষ ছুঁইয়া তোমরা এই বিপদ ঘটাইয়াছ। তখন উভয়ে মিলিয়া দেবীর পূজা করিলেন, তার পর নাতিদের মাথায় নোয়া ঠেকাইয়া দেবীকে প্রণাম করলেন।

ব্রতকথার পাঠ যেমন আলাদা হতে পারে তেমনই নানা জায়গায় একই ব্রতের নাম বদলাতে পারে, বদলাতে পারে একই তিথির পালিত ব্রতের উদ্দেশ্য। যেমন অরণ্যষষ্ঠীকে আমষষ্ঠীও বলা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস আম-কাঁঠালের মাস, অরণ্যষষ্ঠীর অন্যতম উপকরণও আম, তাই এর আমষষ্ঠী নামকরণে অবাক হওয়ার কারণ নেই। আবার জামাইষষ্ঠী নামকরণের পেছনে অনেকে যুক্তি দেখান যে জামাই পুত্রসম, তাকে বৃহত্তর পরিবারবৃত্তে অন্তর্গত করার জন্য এই নামকরণ। তবে এই উদ্‌যাপন নিঃসন্দেহে হাল আমলের আয়োজন। এই যুক্তির বিরুদ্ধে এক পক্ষ তুলে ধরেছেন, বনবাস কালে উলূপীকে অর্জুন বিয়ে করার সময় নাকি তাকে শ্বশুরবাড়িতে খাতিরযত্ন করতে এ প্রথার প্রচলন। এসব যুক্তি যে একেবারেই মনগড়া হিঁদুয়ানি তা বুঝতে বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন নেই।

জামাইয়ের সঙ্গে বাঙালির ঘরে-ঘরে এক মিঠেকড়া সম্পর্ক। কখনও তাকে নিয়ে মজা-আড্ডায় মেতে ওঠে শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা—শালা-শালি তো বটেই, এমনকি শ্বশুর-শাশুড়ি পর্যন্ত। এ নিয়ে গল্পগাছা, প্রহসন, কোনো কিছুরই অভাব নেই। বাংলাদেশের ‘বোকাজামাইয়ের গল্প’ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা

রয়েছে ‘হরপ্পা লিখন চিত্রণ-এর ‘গল্পগাছা’ সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি ২০২০)। এপার বঙ্গেও জামাইকে নিয়ে ঠাট্টা-রসিকতা-চুটকি-তামাসার অন্ত নেই। কখনো-কখনো তা প্রবাদের স্তরে পৌঁছেছে। যেমন ‘জামাতা দশমও গ্রহঃ’, ‘জামাই যে মরদ মেয়ের খোঁপাতেই তার পরিচয়’, ‘জামাই রোষে আপনার মোষে’, কিংবা ঘরজামাই খেদানো ‘প্রহারেণ ধনঞ্জয়’। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্যের *বাংলার লোকসাহিত্য* দ্বিতীয় খণ্ডে ছড়া আলোচিত হয়েছে সেখানে ‘তবুও জামাই ভাত খেল না’ অংশে (পৃ ৪২৪-৪৩৮) এর অনেক নমুনা পাওয়া যাবে।

জামাই নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা মজা-মশকরা হলেও জামাইষষ্ঠী বেশ ধুমধাম করেই পালিত হয় দুই বাংলাতেই। এক সময় ক্ষমতা-অর্থ-প্রভাব-প্রতিপত্তির দর্প দেখাতে জামাইষষ্ঠীর দিন প্রতিযোগিতা হত রাজা-মহারাজ ও ধনবান মানুষদের বাড়িতে। সেসব গল্প আজও মিথের মতো ঘুরে বেড়ায়। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বাড়ির গল্প তার মধ্যে অন্যতম:

মহারাজ ক্ষিতীশচন্দ্র ও কৃষ্ণনন্দিনীর মেয়ে অন্নপূর্ণার স্বামী হৃষিকেষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন বৈঁচির রাজা। তাঁর ছিল পানের নেশা। নানা রকম মশলা দিয়ে সাজা পান ঘন-ঘন খেতেন। সে কালে সাজা পানের খিলি লবঙ্গ দিয়ে গেঁথে রাখার চল ছিল। কিন্তু বৈঁচির রাজার খিলিতে গাঁথা থাকত সোনার লবঙ্গ। পান খাওয়ার আগে সেই সোনার লবঙ্গ পানের তিনি খিলি থেকে খুলে ছুঁড়ে দিতেন। আর রাজবাড়ির ছোটোরা এ-দিক ও-দিক পড়ে থাকা সেই সব সোনার লবঙ্গ কুড়িয়ে নিত।

জামাইষষ্ঠী নিয়ে তবু প্রশ্ন রয়ে যায়। যেমন ২৪ মে, ২০১৫ 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় 'জামাই রহস্য' শীর্ষক নিবন্ধে শ্রীজহর সরকার লিখেছিলেন, "এই দিনটাতে আমার মা তাঁর চঞ্চল ছেলেমেয়েদের শীতলপাটিতে বসিয়ে শোনাতেন, কী ভাবে মা ষষ্ঠী সমস্ত শিশুদের মঙ্গল করেন, তাদের দীর্ঘ জীবন দেন। তিনি কয়েকটি মন্ত্র পড়ে একটা অদ্ভুত দেখতে দূর্বাঘাসের ছোট্ট চামর দিয়ে আমাদের গায়ে মাথায় পুণ্যবারি ছিটিয়ে আশীর্বাদ করতেন, মুঠো ভরে ফলমূল দিতেন। [...] কেউ যাতে নিজের প্রাপ্যের বেশি ভাগ না নেয়, যৌথ পরিবার ধরে রাখার পক্ষে সেটা খুব জরুরি। মা ষষ্ঠীর কাহিনি সেই শিক্ষা দেয়। ভারতে এই লোককাহিনিগুলি কী ভাবে অনেক শতাব্দী ধরে তাদের পুরনো চেহারায় বেঁচে রইল, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাদের বিনাশ করল না, সেটা সত্যিই অবাক করে দেয়। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম মা ষষ্ঠীকে আত্মসাৎ করতে চায়নি তা নয়, খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে হিন্দু যুদ্ধদেবতা স্কন্দ ও তাঁর সহযোগী যৌধেয়র সঙ্গে ষষ্ঠীকে জুড়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল। [...] কিন্তু এ-সবের মধ্যে জামাই ঢুকল কী করে? জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষে সাবিত্রী চতুর্দশীতে স্ত্রীরা স্বামীর দীর্ঘজীবন কামনা করে যমের আরাধনা করেন। মনে হয়, এই লোকাচারটির সূত্র ধরেই কলকাতার বাবু সংস্কৃতি এই ষষ্ঠীটি জামাইকে নিবেদন করেছিল। আঠারো-উনিশ শতকে বাংলার সচ্ছল শ্রেণির মধ্যে বাল্যবিবাহ এবং বহুবিবাহের ব্যাপক প্রচলন হয়, ফলে অগণিত বালবিধবার যন্ত্রণাময় জীবন, বিস্তর সতীদাহ। এই অবস্থায় জামাই ও স্বামীর দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা বাঙালি মা এবং মেয়ের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। অন্তত কলকাতা

ও চার পাশের এলাকায় সন্তানের মঙ্গলকামনার চেয়ে এর গুরুত্ব বেশি ছিল।

যখনই নতুন সংকট আসে, তার মোকাবিলার নতুন চেষ্টাও দেখা যায়। ইতিহাসে বার বার দেখেছি, যুগের প্রয়োজনে সমাজ কী ভাবে পুরনো আচার-অনুষ্ঠানগুলি সংশোধিত করে নেয়। ষষ্ঠী সন্তানের কল্যাণের জন্য পালনীয় একটি ব্রত, কন্যার ভবিষ্যত্ নিয়ে উদ্বিগ্ন বাঙালি মা অন্তত একটি ষষ্ঠীকে পালটে নিয়েছেন, জামাইয়ের জন্য ভূরিভোজের আয়োজন করেছেন।"

আজ আমরাও একের-পর-এক অভূতপূর্ব সংকটের মুখোমুখি হয়ে চলেছি। প্রথমে করোনার আক্রমণ, অকল্পনীয় দীর্ঘ লকডাউন, অনিবার্য আর্থিক মন্দা, জীবিকা হারানো, কয়েক কোটি পরিযায়ী শ্রমিকের দুর্বিসহ অবস্থা, কেন্দ্রীয় সরকারের একের-পর-এক বালখিল্যপনা, লোকঠকানো 'প্যাকেজ' ঘোষণা, স্বার্থান্বেষী ক্ষুদ্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত পদক্ষেপ, তারপর সাইক্লোন আমফানের দমকা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার স্বাভাবিক ভিত্তিকে প্রায় ভেঙে ফেলেছে। ভেঙে পড়েছে অসংখ্য গাছ। দুই শতাব্দীর মধ্যে ভয়ংকরতম ঝড়ে কলকাতাসহ চার-পাঁচটি জেলার অধিকাংশ মানুষ এর সম্মুখীন হয়ে যে ইষ্টনাম জপ ছাড়া অন্য পথ খুঁজে পায়নি, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের সাধের কলেজস্ট্রিট তার না-মরে বেঁচে থাকা দশা নিয়ে ভেবেই পাচ্ছিল না লকডাউনের এই ধাক্কা কীভাবে সামলাবে, মড়ার ওপড় খাঁড়ার ঘা দিয়ে গেল 'আমফান'। ঝড়ে বই-পথের স্টলগুলো ভেঙে জল ঢুকে, বন্ধ কলেজস্ট্রিট পাড়ার প্রায় সমস্ত বইয়ের দোকান প্রকাশকের ঘরে, বাঁধাইখানায়, প্রেসে

11 5 comments 2 shares

Like Comment

ফেসবুকে দেখা জলপ্লাবিত কলেজ স্ট্রিট

জল ঢুকে নষ্ট হল রাশি-রাশি বই, যে-দৃশ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে চোখে জল ধরে রাখতে পারেননি বইপ্রেমী অনেক মানুষ। কলকাতা শহরেই প্রায় পাঁচ হাজার বড়ো গাছ শিকড় উপড়ে পড়ে গেছে, লকডাউনের ফলে পরিবেশে দূষণমাত্রা কমে যেটুকু উপকার হয়েছিল কয়েক ঘণ্টার ঝড়ে তার চেয়ে অনেক-অনেক বেশি ক্ষতি হয়ে গেল, যা পূরণ করতে অনেক বছর লাগবে। দেশের এই অভূতপূর্ব সংকটকালে আমাদের জীবনে নতুন ব্রত ধারণ বা পালন করার সময় এখন, শুধুমাত্র টিকে থাকবার প্রয়োজনে।

ভগিনী নিবেদিতা 'মর্ডান রিভিয়্যু' পত্রিকার অগস্ট ১৯০৮ সংখ্যায় 'The place of the Kindergarten in Indian schools' নামক প্রবন্ধে ব্রত সম্পর্কে লিখেছিলেন, "Nothing could be more perfect educationally than the *bratas* which Hindu society has preserved and hands to its children in each generation, as perfect lessons in worship, so in the practice of social relationships, or in manners. Some of these *bratas*—like that which teaches the service of the cow, or the sowing of seeds, or some which seem to set out on the elements of geography and astronomy—have an air of desiring to impart which we now distinguish as secular knowledge. They appear, in fact, like surviving fragments of an old educational scheme. But for the most part, they constitute a training in religious ideas and religious feelings."

প্রায় একশো বছর পর ২০১০ সাধারণ অব্দে কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী তাঁদের *বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ : ক্রিয়াভিত্তিক বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান*-এর দ্বিতীয় খণ্ডে লিখছেন, "আজকাল ব্রত শব্দটি শুনলেই আমরা ভাবি বুঝিবা ধম্মকম্মোর ব্যাপার হবে। কিন্তু যখন কারও নাম শুনি 'দেবব্রত', 'তপোব্রত', 'সুব্রত', 'সেবাব্রত'... ইত্যাদি কিংবা 'বিব্রত', 'সেবাব্রতী', 'শিক্ষাব্রতী', 'মৌনব্রতী'... প্রভৃতি শব্দ শুনি এমনকি নকশালদের মত ধর্মবিরোধী দল যখন তাদের পত্রিকার নাম রাখে, 'দেশব্রতী' তখন কিন্তু আমাদের চোখ কোঁচকায় না। তার মানে বাংলাভাষা শব্দটিকে তার যথার্থ মর্য্যাদা দিয়ে রেখেছে, কিন্তু আমরা শিক্ষিত বাংলাভাষীরা শব্দটিকে সমাজের সমস্ত এলাকা থেকে ঠেলে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক-ধর্মের এলাকায় ব্যবহারের জন্য ঠেলে দিতে চাই।" (পৃ ২৬২)।

তাঁদের মতে, আমরা এক প্রকার ভাষাবিভ্রাট-এর শিকার। 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সামাজিক সত্তাকে দেখতে পেলেই তাকে বোঝানোর জন্য সেকালের শব্দবিদগণ নতুন শব্দের সৃজন করতেন; দৃশ্য তা সে সক্রিয় হোক আর নিষ্ক্রিয় হোক তা নিয়ে তাঁদের মাথা ব্যাথা ছিল না; কারণ তা আঙ্গুল তুলেই দেখিয়ে দেওয়া যায়। এর মধ্যে আরও একটি সমস্যা দেখা দেয়। 'অদৃশ্য কিন্তু সক্রিয়' সত্তাটিকে শনাক্ত করার জন্য যে শব্দটি তৈরি করা হল,

সেটি বলার পরেও কেউ যদি না বুঝতে পারে তাহলে সেই সত্তার সাদৃশ্যে দৃশ্য কোনো সত্তাকে দেখিয়ে দেওয়াই ছিল সেকালের স্বাভাবিক রীতি। বঙ্গীয় শব্দকোষে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় শব্দের অর্থ দিতে গিয়ে এই 'সাদৃশ্যে' শব্দটি বারংবার ব্যবহার করেছেন। (পৃ ২৮২)

ব্রতের অর্থ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কলিম খান বলছেন, "কোন একটি বিশেষ প্রকল্পের দায়িত্ব বহন করা হয় যে কর্ম্মশৃঙ্খলের মাধ্যমে, (বিশেষ প্রকার বহন কর্ম্ম তারিত যাহাতে) তাকে ব্রত বলে। সেভাবেই, সেবা প্রকল্পের দায়িত্ব বহন করা হয় যে কর্ম্মশৃঙ্খলের মাধ্যমে, তাকে 'সেবাব্রত' বলে। সেবাব্রত সক্রিয়ভাবে করাই যার কাজ, তাকে বলে সেবাব্রতী।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে, চান্দ্রায়ণব্রত, অসিধারাব্রত ...ইত্যাদি ব্রতগুলি ব্রত নয়। এগুলিও ব্রত। তবে এর মধ্যে এমন একটি গুরুতর বিষয় আছে, যা কেউই খেয়াল করেন না। তা হল, প্রকৃত বাস্তব ব্রত-অনুষ্ঠান ও তারই প্রতীকী ব্রত-অনুষ্ঠান। ... বাস্তবে একজন কৃষক তার কৃষি উৎপাদন কর্ম্মযজ্ঞ চালিয়ে ফসল তুলে বাজারে বিক্রয় করে দিচ্ছেন —এটি হল তাঁর প্রকৃত বাস্তব চান্দ্রায়ণ-ব্রত অনুষ্ঠান। আর, পুরোহিত ডেকে তিনি যে চান্দ্রায়ণ-ব্রত অনুষ্ঠান করেন, সেটি হল সেই বাস্তব চান্দ্রায়ণ-ব্রত অনুষ্ঠানের প্রতীকী আচার-অনুষ্ঠান। বিশ্বাস না হলে, পুরোহিত পরিচালিত চান্দ্রায়ণ-ব্রত অনুষ্ঠানে প্রতিটি আচরণকে বিস্তারিত করে নিন, উপকরণগুলির প্রকৃত ক্রিয়াভিত্তিক অর্থে চলে যান, দেখবেন, বাস্তব চান্দ্রায়ণ-ব্রত অনুষ্ঠানের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এগুলো বহু ক্ষেত্রে হুবহু মিলে যাচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ পুরোহিত

ও যজমানেরা বাস্তবের সঙ্গে প্রতীকী আচরণের এই সম্পর্কটি ভুলে গেছেন। ফলে পুরোহিতের যজ্ঞানুষ্ঠানাদি পরিণত হয়েছে বাজে অর্থহীন আচরণে। আর সেজন্যই ব্রত শব্দটি শুনলেই যুক্তিবাদীগণের ভ্রূ কুঁচকে যায়। কিন্তু তাতে কী? না ঐ যুক্তিবাদীরা পুরোহিতদের কার্যকলাপ বোঝার চেষ্টা করছেন, না পুরোহিতরা তাদের নিজেদের কার্যকলাপের অর্থ মনে রেখেছেন এবং তা যুক্তিবাদীদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। [...] যাকগে, ব্রত-এর দু-রকম আচরণ—বাস্তব আচরণ ও প্রতীকী আচরণ এবং তাদের মধ্যেকার সম্পর্ক ছেদনের গল্প আমরা শুনলাম। কিন্তু যে হারু স্যাকরা পি সি চন্দ্র জুয়েলার্স থেকে সোনার তাল নিয়ে এসে নির্দেশানুসারে অলঙ্কার বানিয়ে তাদের দিয়ে আসে এবং সেভাবেই সে তার পরিবার পরিজন নিয়ে, বলতে গেলে, একটি স্বর্ণ শিল্পীদের সংস্থা চালায়, তাকে কী বলা হবে? সেকালে পি সি চন্দ্রের মতো সংস্থাকে বলা হত বৃক্ষ, আর হারু স্যাকরার মতো সংস্থাকে বলা হত ব্রততী। কারণ, সে বৃক্ষের ব্রত-এর তারণকার্য ধারণ করে। তাই সে ব্রততী। যেহেতু লতাও একইভাবে বৃক্ষকে জড়িয়ে ধরে, সেই কারণে লতাকেও ব্রততী বলা হত।" (পৃ ২৬২)

"বৃক্ষ শব্দের মূল অর্থ হল, সামাজিক উৎপাদন সংগঠন। সে সংগঠনের যত রকম রূপ, বৃক্ষও তত রকম। সেই সব বৃক্ষাদি নিয়েই 'সংসার অরণ্য'। সামাজিক উৎপাদন সংগঠনের জটিল ব্যবস্থাকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যথার্থ উপলব্ধি করে দেখেছিলেন যে, এর সঙ্গে বৃক্ষের জটিলতার ঘনিষ্ঠ মিল রয়েছে। তাই তারা। forest-এর tree-কে যেমন বৃক্ষ নাম দিয়েছিলেন, তেমনি সংসার বনের তরুকেও বৃক্ষ নামে শনাক্ত করেছিলেন।" (পৃ ৩৪২)

অরণ্য শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলতে গিয়ে কলিম খান বঙ্গীয় শব্দকোষ উদ্ধৃত করে বলছেন, "অরণ ('অবিদ্যমান যুদ্ধ'/ব. শ.) রহে যাহাতে।/ যাহা রম্য নহে; (কথাটিতে বঙ্গীয় শব্দকোষকারের নিজেরই বিশ্বাস হয়নি বলে বন্ধনীর ভিতরে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিয়ে গেছেন।) যে স্থানে শেষ বয়সে যায়; শ্বাপদেরা যেখানে যায়। (ব.শ.)। ৩. বিপিন, কানন, বন। শঙ্করাচার্য কৃত দশ উপাধি তীর্থ, আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি, পর্বত, সাগর, পুরা, সরস্বতী, ভারতী। (ব.শ.)। ৪. forest অর্থে প্রচলিত। ৫. 'অগ্নিজননার্থ যে কাষ্ঠ কাষ্ঠান্তর দ্বারা ঘৃষ্ট হয় (ব.শ.) তাকে অরণি বলে। এর একটি অধরারণি অন্যটি উত্তরারণি। এরা দুই বিপরীতমুখী সত্তা পরস্পরকে ঘর্ষণ করে, কিন্তু নিঃশেষে বিনাশ করে না, অগ্নি উৎপাদন করে। তদ্রূপ যেখানে ক্রেতা বিক্রেতা এই দুই বিপরীত সত্তা পরস্পরকে আঘাত করে কিন্তু হত্যা করে না, সেই স্থানকে অরণ্য বলে। সেই সুবাদে পণ্য বিনিময়-স্বীকৃত সমাজসংসারই অরণ্য পদবাচ্য। কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতে অরণ্য নামে একটি পৃথক উপ-অধ্যায় রয়েছে, যেখানে বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহকারে বাঝোনো হয়েছে, এই মহাসংসারই মহারণ্য।" (পৃ ৬১১)

প্রথমে করোনার আক্রমণে ক্রমবর্ধমান লকডাউন, পরবর্তীতে সাইক্লোন আমফান, আমাদের উভয়প্রকার অরণ্যকেই প্রায় ধ্বংসের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। তাই এবারে লকডাউনের ফলে প্রায় বাতিল জামাইষষ্ঠী, অরণ্যষষ্ঠী হিসাবেই পালিত হোক, অনেক নতুন 'বৃক্ষ'-রোপণ করতে হবে আমাদের আগামী দিনগুলোতে।

প্রকাশিত